রবীন্দ্রনাথের তিনটি নাটক : পরিপ্রেক্ষিত ও শিল্পমূল্য

অসীম দাশ*

[সারসংক্ষেপ : সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথ ধরে, দিন বদলের পালায় পুরাতন আঙ্গিক ভেঙে 'নাটক' পরিবর্তিত হাওয়ার সাথে সঙ্গতি রেখে নবরূপ পরিগ্রহ করেছে। কখনো অন্তরের অদম্য তাগিদে – গভীর আত্মিক উপলব্ধি থেকে, আবার কখনো সামাজিক কৃত্যাচারের মধ্য দিয়ে উচ্চাঙ্গের বিকাশে পৃথিবীর নানা দেশে নাটক এসেছে, এসেছে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা। প্রিমিটিভ অ্যারেনা থেকে – উন্মুক্ত প্রান্তর ছুঁয়ে – গৃহবন্দী 'থিয়েটার' – প্রসেনিয়াম – নন্ প্রসেনিয়াম হয়ে আরও কত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সমৃদ্ধ হয়েছে দর্শকদের সাথে নিয়ে। ক্রমে এই পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে নাট্যের দৃশ্যময়তায় ও কাব্যময়তায়। নাটকের এই কাব্যধর্মিতা এবং কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত দৃশ্যময়তার এক অপরূপ বুনন রবীন্দ্রনাটকে পরিলক্ষিত হয়। পরাবাস্তবের কালকে ভেঙে অন্তহীনকালে নিত্য আসা যাওয়া রবীন্দ্রনাট্যের। দর্শকের অনড় অভ্যাসকে নাড়িয়ে দেওয়ার এক অনবদ্য প্রয়াস তাঁর নাট্যকৃতি। তাঁর হাতে সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশের প্রথম পরিণত থিয়েটার– একমাত্র থিয়েটার, যা প্রত্যেকটি কালের সঙ্গে সমকালীন, প্রত্যেকটি নাটকীয় রূপবন্ধের আত্মীয় অথচ কোনটাতেই চিরস্থায়ীরূপে রুদ্ধ নয় বরং সার্বত্রিক, সার্বভূমিক। বহুবিস্তৃত, শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্পমণ্ডিত বাঙালির নাট্যচর্চায় প্রকৃত শৈল্পিক ভবিতব্য নির্দেশে রবীন্দ্রনাথের নাটককে সাম্প্রতিক নাট্যকর্মে নাট্যজনেরা কতটুকু ধারণ করতে পেরেছে চর্চায় ও মননে, এই প্রবন্ধ তা দেখার একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।]

প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা নাটক আত্মনির্ভরশীল ছিল না। সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের উপর ভিত্তি করেই বাংলা নাটক দাঁড়িয়েছিল। উল্লেখ্য, নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকূলসর্বস্ব' সাফল্যের সাথে অভিনীত হওয়ার পরও পুনরায় বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অনুবাদ নাটকের জোয়ার বইতে থাকে। দুই বাংলার বিভিন্ন মঞ্চ জুড়ে তখন *অভিজ্ঞান শকুন্তলম্*, *উত্তররামচরিত*, *বিক্রোমোর্বশীয়*, *রত্নাবলী*, *বেণীসংহার*-এর পাশাপাশি চলছিল *বিল্বমঙ্গল*, *জটিলচরিত*, *সীতার বনবাস*, *প্রভাসমিলন* ইত্যাদি নাটকের মঞ্চায়ন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের আগ পর্যন্ত যেসব নাটক বা যাঁদের নাটক আমরা পেলাম তাকে নাটক না বলে, নাটকের আভাস বলাই শ্রেয়। তাঁদের মধ্যে হরশ্চন্দ্র ঘোষ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম প্রসিদ্ধ। এরপরে এলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। শর্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী, পদ্মাবতী - নায়িকারাই ঐ নাটকগুলির প্রধান চরিত্র। বাংলায় প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি তাঁরই *কৃষ্ণকুমারী*। এই সময়ের অন্য আরেকজন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। সময়ের চিত্র যাঁর নাটকে ধরা পড়ে সবচেয়ে বেশি। তাঁর *নীলদর্পণ* বাংলা নাটকের প্রথম প্রতিবাদী নাটক এবং একটি মাইল ফলক। ঢাকায় নীলদর্পণ নাটক মঞ্চস্থ হয় ১৮৬১ সালে। এই নাটককে অবলম্বন করেই বাঙালির প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় যাত্রা শুরু করে। ১৮৭৩ সালে জাতীয় নাট্যশালার দ্বার উদ্‌ঘাটন হয় দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* নাটক দিয়েই।

---

*সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাংলা সাহিত্যে প্রধান হয়ে উঠেছিল স্বাদেশিকতাবোধ। এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশের গৌরবময় ইতিহাস নিয়ে নাটক লেখেন। উনি বাংলা নাটককে খানিকটা সংস্কার প্রভাবমুক্ত করেছিলেন। তাঁর ভাষা ও পাত্র-পাত্রীর আচরণ অনেকটাই বস্তুনিষ্ঠ ছিল। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে অন্যান্য জমিদার বাড়িগুলোর মতোই তখনকার রীতি অনুসারে নাটক অভিনীত হত। জানা যায় :

> গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় চৌধুরী, যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণবিহারী সেনের কমিটি অব ফাইভ এর আগে থেকেই পারিবারিক পরিবেশে শৌখিন নাট্যপ্রচেষ্টার পরিচয় দিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ। তিনি *বাবুবিলাস* নাটকে বাড়ির সবাইকে আসরে নামিয়েছিলেন। (অজিত, ১৩৬২ : ৫)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা রঙ্গমঞ্চের একজন জনপ্রিয় নাট্যকার। তাঁর *পুরুবিক্রম* ও *সরোজিনী* ন্যাশনাল থিয়েটার ও বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়। *সরোজিনী* সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ১৪ বছরের রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের জন্য একটি গান লিখেছিলেন : 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "*সরোজিনী* প্রকাশের পর হইতেই আমরা কবিকে প্রমোশন দিয়া আমাদের সমশ্রেণিতে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সঙ্গীত ও সাহিত্য চর্চায় আমরা তিনজন – অক্ষয় চৌধুরী, রবি ও আমি –।" (বসন্তকুমার, ১৩২৬ : ১৫১)

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির নাট্যগোষ্ঠী তাদের নাটক ছাড়াও অভিনয় করেছিল মাইকেলের *কৃষ্ণকুমারী* এবং *একেই কি বলে সভ্যতা* নাটকে। ঠাকুরবাড়ির আর একজন অন্যতম নাট্যকার, যাঁকে নিয়ে এই প্রবন্ধ রচনার ক্ষুদ্র প্রয়াস – তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৭৯৫ সালকে যদি আধুনিক বাংলা নাটকের সূচনালগ্ন ধরা হয়, তাহলে বর্তমানে দু'শ পঁচিশ বছর অতিক্রম করেছে বাংলা নাটকের পথচলা। গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য, হেঁয়ালিনাট্য, ঋতুনাট্য, তত্ত্বনাট্য, প্রহসন, রূপান্তর ও নামান্তর এরূপ বহু বিচিত্র প্রবাহ নিয়ে এ যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের সময়কাল প্রায় ষাট বছর – নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ, অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ, পরিচালক রবীন্দ্রনাথ এরূপ নানা অভিধায় তিনি অভিষিক্ত হন। বিশ্বব্যাপী সভ্যতার সংকটের এক অস্থির সময়ে এই স্রষ্টার সৃষ্টি রূপ থেকে অরূপের সন্ধানে নিমগ্ন। বাস্তবিকের রুদ্ধ দেয়ালকে সরিয়ে আধুনিকতাকে ধরবার এক অনন্য প্রয়াস রবীন্দ্রনাটক। তাঁর অলোকসাধারণ প্রতিভা এদেশের নাটককে ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চ অবলম্বন করে বিস্তার লাভের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক নতুন দিশা দেখিয়েছিল এবং বাংলা নাটককে সেই যুগে ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের অধীনতা শৃঙ্খল হতে মুক্ত করে এনেছিল। শুধু নাটক লিখে নয়, অভিনয়রীতি এবং মঞ্চ সম্পর্কে স্বীয় মৌলিক চিন্তাচেতনায় ইউরোপীয়দের নকল না করে, সমস্ত রকম বাহুল্য বর্জন করে মঞ্চকে অভিনয়যোগ্য করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর কথায় : "রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যস্থাপনার মধ্যে যাত্রার তুল্য মুক্তি চাই।" এটা নিশ্চিত করে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ যা কিছু Performed হবার জন্য লিখেছেন তার সবই নাটক। সুতরাং গীতিনাট্য– *বাল্মীকি প্রতিভা*, *মায়ারা খেলা*; নৃত্যনাট্য– *শাপমোচন*, *শ্যামা*; ঋতুনাট্য– *নবীন*, *শ্রাবণগাথা* সবই নাটক। বিচিত্র রসের বিচিত্র রূপের রবীন্দ্রনাটক। তাই আমরা দেখতে পাই, বাঙালির নাট্যচর্চায় হোক সে পেশাদার মঞ্চে, ঘরোয়া পরিবেশে, স্কুল-কলেজের সংস্কৃতি চর্চার আসরে – রবীন্দ্রনাথ উঠে এসেছে বার বার এবং সফলভাবে।

প্রত্যেক নাট্যকার তাঁর সমকালীন দর্শকদের তৃপ্ত করেই কালজয়ী নাটক রচনা করে থাকেন। এলিজাবেথীয় দর্শকদের ভালো লাগার এবং দৈনন্দিন জীবনের বিষয়বস্তু শেক্সপিয়র তাঁর নাটকে যেমন তুলে এনেছিলেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথও। যদিও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভালোলাগা ও দৈনন্দিন জীবনের তারতম্য ব্যাপক। কিন্তু তার মধ্য থেকে দুই নাট্যকারই মানবচরিত্রের জটিল দ্বন্দ্ব, আনন্দ-জিজ্ঞাসা, অসীম উপলব্ধি ও কাব্যের বুনন তাঁদের নাটকে তুলে এনেছেন স্বীয় প্রতিভায়, যা বিশ্বসাহিত্যে এক অনন্য বিস্ময়। শুধু বাহ্য আড়ম্বর ও দৃশ্যময়তা এঁদের নাটককে সার্বজনীন করে তোলেনি বরং সমকালকে তৃপ্ত করে শ্রেণি সীমানা অতিক্রম করতে পেরেছিল বলেই তাঁদের রচনা কালোত্তীর্ণ। যদিও মলিয়ের, শেক্সপিয়র, ইবসেন প্রমুখের মতো সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ মোটেই অপরিচিত ছিলেন না। তাঁর প্রথম উপন্যাস *বৌঠাকুরানীর হাট*, *রাজা বসন্ত রায়* নামে অভিনীত হয় ১৮৮৬ সালের জুলাই মাসে এবং জনপ্রিয়তাও পায়। ১৮৮৬ থেকে ১৮৯৫ এই ৯ বছরে নাটকটির অভিনয় সংখ্যা ৪৫। "সে যুগে, যখন ১০-১৫ রাত অভিনয়ের পরেই নতুন নাটকের প্রয়োজন হত – সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই অভিনয়ের সংখ্যাকে ভালোই বলতে হবে" (রুদ্রপ্রসাদ, ১৯৯৯ : ১৪)। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলেও মিনার্ভায় তা অভিনীত হয়েছিল। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নাট্যতরীর পালে যেন নতুন হাওয়া লেগেছিল রবীন্দ্রনাট্যের ছোঁয়ায়। তিনি ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে লিখলেন *রাজা ও রানী*, এটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক এবং শেক্সপিয়রীয় রীতিতে লেখা নাট্যকাব্য। তার এক বছর পরেই *বিসর্জন*। রবীন্দ্রনাথের এই দুটি নাটকই বাংলা নাট্যসাহিত্যে সবচেয়ে শেক্সপিয়রনিষ্ঠ নাটক, যার চরিত্রের অন্তররহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বাইরের সংঘাতের মধ্য দিয়ে। দুটি নাটকেই, তুলনামূলকভাবে *বিসর্জন*–এ কাব্যের ছন্দোবদ্ধ বিন্যাসে সংলাপের গতিশীলতা এবং কাব্যিক গভীরতা – যা একান্তই শেক্সপিয়রীয়, তা বহুলাংশে রক্ষিত। সমগ্র বাংলা নাট্যসাহিত্যে একমাত্র *রাজা ও রানী* এবং *বিসর্জন* এ দুটি নাটককে বিবেচনা করা হয় খাঁটি মহৎ 'দৃশ্য-কাব্য' যা দৃশ্য না হলেও কাব্য। যে দৃশ্যকাব্যের ব্যাখ্যায় Aristotle বলেছেন : "অভিনয় ছাড়াও যার আস্বাদ করা চলে।" অভিনব গুপ্ত বলেছেন : "অভিনয় ছাড়াই নাট্যের বাক্যাংশ থেকে রসের উপলব্ধি হয়।"

রাজা ও রানী সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিল। ১৮৯০ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল এমারেল্ড, বেঙ্গল থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার, কোহিনূর, স্টার মঞ্চ, আর্ট থিয়েটার প্রকৃতপক্ষে কলকাতার প্রায় সকল মঞ্চে সগৌরবে অভিনীত হয়েছে *রাজা ও রানী*। ঠাকুরবাড়ির অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দ্বারা অভিনীত হবার সময় থেকেই সাধারণ রঙ্গমঞ্চের দৃষ্টি ছিল নাটকটির দিকে। প্রকাশের পরপরই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরজিতলার বাড়িতে, একতলায় চওড়া বারান্দায় স্টেজ বেঁধে নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় ১৮৮৯ সালের ৫ অক্টোবর। রবীন্দ্রনাথও এতে অভিনয় করেছিলেন। সেদিন পারিবারিক অভিনয়কালে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের নট-নটীরা সে অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেন :

> [...] আমাদের যখন *রাজা ও রানী* অভিনয় হয় সে সময়ে একদিন কী করে পাবলিক অ্যাক্‌ট্রেসরা ভদ্রলোক সেজে অভিনয় দেখতে ঢুকে পড়ে। আমরা কেউ কিছু জানিনে। [...] তারা তো সব দেখেশুনে গেল। এখন পাবলিক স্টেজ *রাজা ও রানী* অভিনয় করবে, আমাদের নেমন্তন্ন করেছে। আমরা তো গেছি, রানী সুমিত্রা স্টেজে এলো, একেবারে মেজো জ্যাঠাইমা। গলার সুর অভিনয়, সাজসজ্জা, ধরনধারণ হুবুহু মেজো জ্যাঠাইমাকে নকল করেছে। মেয়েদের আরো

> অনেকের নকল করেছিল, রবি কাকাদের নকল করবে কী করে। ছেলেদের পার্ট ততটা নিতে পারেনি। কিন্তু মেজো জ্যাঠাইমার সুমিত্রাকে যেন সশরীরে এনে বসিয়েছিল। অদ্ভুত ক্ষমতা অ্যাকট্রেসদের, অবাক করে দিয়েছিল। (অবনীন্দ্রনাথ, ১৩৯০ : ১০৭)

সাধারণ রঙ্গালয়ে আর একটি মঞ্চসফল নাটক *চিরকুমার-সভা*। নাটকটি 'দি আর্ট থিয়েটার' স্টার মঞ্চে সর্বপ্রথম অভিনীত হয় ১৯২৫-এর ১৮ জুলাই। দ্বিতীয় অভিনয়ে অর্থাৎ "২৫ জুলাই ১৯২৫ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এলেন *চিরকুমার-সভার* অভিনয় দেখতে" (রুদ্রপ্রসাদ, ১৯৯৯ : ৭৩)। অতিরিক্ত চেয়ার বসিয়েও সেদিন দর্শকদের স্থান সংকুলান করতে পারেননি আয়োজকগণ। ১৯২৫-এর ১৮ জুলাই থেকে অক্টোবর ১৯৪০ এই পনের বছরে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে মোট ৬৪ বার অভিনীত হয়েছে *চিরকুমার-সভা*।

নাটক হিসেবে 'বিসর্জন' উচ্চাঙ্গের হলেও *রাজা ও রানী*র মত সাধারণ রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপন করার পক্ষে বাধা ছিল তার বিষয়বস্তু। তাই মূলত বাড়ির ছেলেদের অভিনয় ছাড়া বাইরে সেই নাটকের অভিনয় অনেক পরে হয়েছিল। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে *বিসর্জন* অভিনীত হয়েছিল সংগীত সমাজে। ১৯২৬-এর ২৬ জুন শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায়, নাট্যমন্দিরের প্রযোজনায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয় হয় *বিসর্জন* নাটকের।

নাট্যকাব্য *চিত্রাঙ্গদা* ও *গোড়ায়গলদ* – শেক্সপিয়রীয়রীতির কোনো ছাপই এতে নেই। অনুমান করা যায় রবীন্দ্রনাথের নাট্যবোধ তখন পাশ্চাত্যরীতি থেকে মোড় নিতে শুরু করে অন্যদিকে। *গোড়ায়গলদ* বাংলা নাট্যসাহিত্যে একটি সম্পূর্ণ পৃথক Genre, Wit, Humour। এই নাটকটি বাংলা প্রহসন বা কৌতুকনাট্যে একটি দিক চিহ্ন। *গোড়ায়গলদ* প্রথম অভিনীত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সংগীত সমাজ'-এ ১৯০০ সালে রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায়। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল ১৯১০-এ এবং *শেষরক্ষা* নামে পরিবর্তিত আকারে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রযোজনায় নাট্যমন্দিরে অভিনীত হয়েছিল ১৯২৭-এর সেপ্টেম্বরে। জানা যায়, পাবলিক থিয়েটারে নাটকটি অভিনয় উপযোগী করার জন্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ নাটকটিকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন। নতুন নামকরণ করে দেন *শেষরক্ষা*। যথারীতি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে গেলে শিশিরকুমারকে ডেকে সেটি তাঁর হাতে তুলে দেন রবীন্দ্রনাথ। নামটিও বদলে গেছে দেখে শিশিরকুমার মন্তব্য করেন : "গুরুদেব, দর্শক আনার পক্ষে *গোড়ায়গলদ* নামটি কিন্তু বেশ ছিল।" উত্তরে কবি বলেছিলেন : "গোড়ায়গলদ ছিল, কেটে কুটে শেষরক্ষা করলাম, তাও তোমার মন পেলাম না, শিশির"। (রুদ্রপ্রসাদ, ১৯৯৯ : ১৬৫)

শিশিরযুগে রবীন্দ্রনাট্যের সাথে এই যোগাযোগ আবার ঘনিষ্ঠ রূপ ধারণ করে এবং এর কারণ হচ্ছে শিশির ভাদুড়ীর প্রয়োগ নৈপুণ্য সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা। তিনি নিজেও রবীন্দ্রনাথের মুখে *রক্তকরবী*র পাঠ শুনার পর তা অভিনয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। যদিও শিশির ভাদুড়ী তাঁর পরিচালনা ও অভিনয়ে প্রায় শূন্য প্রেক্ষাগৃহে *তপতী*র অভিনয় চালিয়েছিলেন নাট্যমন্দিরে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর 'রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে আক্ষেপের সাথে বলেছেন :

> বাংলার জাতীয় রঙ্গমঞ্চের বিশেষ প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথের মতো নাটককারের। [...] আমাদের দেশের নাটককারদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, দর্শক

> বিচারকের মতো আসনে বসে থাকবেন এবং অভিনেতা মঞ্চের কাঠগড়ায় আবদ্ধ আসামীর মতো অভিনয় করবে – এই ব্যবস্থার মধ্যে একটা ঘোরতর অসামঞ্জস্য আছে। দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে যে বেড়া সেকালের যাত্রা, গ্রিক ট্র্যাজেডির অভিনয়ে, এমনকি শেক্সপিয়রের থিয়েটারে ছিল না, যে বেড়া তুলে দেবার জন্য বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োগাচার্য মায়ারহোলদ ও রাইনহার্ট চেষ্টা করে আংশিকভাবে কৃতকার্য হয়েছেন, সে বেড়া তুলে দেবার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথও তাঁর নিজস্ব দল নিয়ে দু'একবার করেছেন। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে গড়ে উঠলো না। (দেবকুমার, ২০০৭ : ৪৯-৫০)

শিশিরযুগের একাধিক প্রযোজক সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে চালাতে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থ হয়েছেন একমাত্র দর্শকের শিক্ষা ও রসজ্ঞানের অভাবে। নির্মল আনন্দ বা চিত্ত বিনোদনের জন্য *চার আনাকা খেল* দেখার দর্শক কীভাবে নেবে *গৃহ প্রবেশ*, *পরিত্রাণ*, *চিত্রাঙ্গদা*, *বিদায় অভিশাপ*, *তপতী*, *যোগাযোগ*-এর মতো নাটক? দেখা যায় ১৮৮৬-১৯৪৯ এই কালপর্বে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ রচিত নাটক এবং তাঁর উপন্যাস বা গল্পের নাট্যরূপ মিলিয়ে প্রায় ২৫টি নাটক অভিনীত হয়। তথাপি রবীন্দ্র-সমকালে এই চর্চার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় একটা পারস্পরিক ঔদাসীন্য। এ প্রসঙ্গে রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী তাঁর *সাধারণ রঙ্গালয় ও রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থের প্রস্তাবনায় মন্তব্য করেন : "সাধারণ রঙ্গালয় রবীন্দ্রনাথের নাটক চেয়েছে ব্যবসার খাতিরে, যেসব নাটক সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জনে ব্যর্থ হয়েছে তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে" (রুদ্রপ্রসাদ, ১৯৯৯ : ১৫)। একটু এগিয়ে তিনি আবার বলেন :

> এর কারণ কী? আমাদের মনে হয় সাধারণ মঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের মধ্যে একটা অনুকূল সম্পর্ক গড়ে উঠলেও সাধারণ দর্শকের মন তাঁর নাটক দর্শনে প্রস্তুত ছিল না। ফলে এক দুরতিক্রম্য ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর নাটকের অভিনয়ে আর সাধারণ দর্শকের মধ্যে– যা থেকে এক বদ্ধমূল ধারণা তৈরি হয় যে রবীন্দ্র নাটক সাধারণ মঞ্চে অচল। (রুদ্রপ্রসাদ, ১৯৯৯ : ১৫)

হয়তো এভাবেই ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সম্পর্ক ছিন্ন হতে থাকে। 'নিজের সম্বল কানা কড়া'ওয়ালা লোকের রুচির পরিবর্তন তিনি বোধহয় ততটা করাতে পারেননি সে সময়ে। কিন্তু নাটক এবং নাটকের বিভিন্ন ফর্ম নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত থাকে শেষ অবধি।

শারদোৎসব নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নতুন নাট্যপরিক্রমার শুরু। নবনাট্য ভাবনা প্রসঙ্গে ১৩০৯ সালের পৌষে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রথাসিদ্ধ বিলিতি মঞ্চকে নাকচ করে দিয়েছেন। দৃশ্যপটের অনাবশ্যকতার উপর জোর দিয়ে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে : "বিলাতের নকলে যে থিয়েটার তাহা একটা ভারাক্রান্ত ক্ষীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের ঘরের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য" (রবীন্দ্রনাথ, ২০০২ : ৫০)। এই জন্যে তাঁর স্বদেশি যাত্রার প্রতি টান। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে না। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের উপর নির্ভর করে পুরো নাট্যক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। বাংলার ঐতিহ্য ও বাংলার প্রকৃতির আদলে গড়ে ওঠা উদাত্ত সুরের পরিবেশনা যাত্রার নিজস্বতা রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করে নাট্যের নতুন পথের সন্ধানে। আর এই যাত্রা

জাতীয় রীতির আত্মপ্রকাশ দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের *শারদোৎসব*-এ। বাংলার লোকায়ত ঐতিহ্যের সাজানো ডালা নবআঙ্গিকে দর্শকশ্রোতার সম্মুখে উপস্থাপনে এটি তাঁর নবতর প্রয়াস। দেশীয় মেলার এক অপরূপ আয়োজন। এ যেন আত্মমুক্তির সদুপায়। যা একান্তই শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক ঔদার্য ও ঋতুবৈচিত্র্যের প্রভাব, তার সাথে পদ্মাপারের চিরপীড়িত স্বজন বৎসল বাঙালির সান্নিধ্যে আপনচিত্তের উদ্বোধন। নাট্যরচনায় ও প্রয়োগে এ যেন 'জটিল কর্মযজ্ঞের সরল পরিবেশনা'। এই *শারদোৎসব* অভিনয়ের আগে থেকে বাস্তবানুগ দৃশ্যসজ্জার ধারণা একেবারেই নাকোচ করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। মঞ্চ থাকবে সহজ, সৌন্দর্যে স্বাভাবিক, অথচ ইঙ্গিতময়-সাংকেতিক। এই ছিল কবির অভিমত। *ফাল্গুনী* নাটকের অভিনয়কালে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> এই যে, গাছের ডাল কেটে কৃত্রিম বন তৈরি হয়েছে – এটাও আমার ইচ্ছা ছিল না। এইসব সরঞ্জাম দর্শকদের অনেক সাহায্য করে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সাহায্য এমনি বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছে যে, দর্শকদের কল্পনা নাকি প্রায় লোপ হবার দাখিল হয়েছে। নাট্যকারের লেখায় যদি প্রাণ থাকে তাহলে দর্শকবৃন্দের কোন বাধাই থাকা উচিত নয়। (রুদ্রপ্রসাদ, ১৯৯৫ : প্রস্তাবনা)

ভরত নাট্যশাস্ত্র অনুসারে দৃশ্যপটবিহীন নাট্য-উপস্থাপনা ছিল রবীন্দ্রনাথের নব্যনাট্যাদর্শের মূলকথা। অকৃত্রিম, আড়ম্বরশূন্য। রবীন্দ্রসংলাপের কাব্যময়তার প্রতি পরতে পরতে সাজানো এক অপরূপ দৃশ্যময়তা। বয়ান এবং বর্ণনে চৌকষ অভিনেতা এবং কল্পনাপ্রবণ ও সৃজনশীল নির্দেশকের যুগল উপস্থাপনায় তার বহিঃপ্রকাশ সম্ভব। এই বিশ্বাস ছিল কবিবরের।

এই পথেই আমরা পেলাম *রাজা*, *অচলায়তন*, *ডাকঘর* – যে সব রচনায় রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ছিল গদ্য দিয়ে কবিতার অন্তর্লোককে স্পর্শ করা। যার সার্থকতা লাভ করেছে *ডাকঘর* নাটকে। লিরিক্যাল গদ্যের ভিতর দিয়ে মৃত্যুর সুন্দর, মহৎ ও সহনীয় আয়োজন *ডাকঘর*। এই নাটকে মৃত্যুকে প্রতীকের ছদ্মবেশ পরিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। *ডাকঘর*-এ ভাষা যে সমর্থ তার প্রমাণ, এতে *রাজা* বা *অচলায়তনের* মতো গানের প্রয়োজন হয়নি। নাটকের ক্ষেত্রে গদ্যকেই একমাত্র বাহন করার চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ কতদূর সমর্থ হয়েছিলেন তার প্রমাণ পাই আমরা তাঁর *মুক্তধারা* ও *রক্তকরবী*তে। Andor Orand Carious নূপুর গাঙ্গুলী লাহিড়ীর *রক্তকরবী* নাটকের Translation & adaptation Preface প্রসঙ্গে বলেন :

> In this allegorical play, Tagore uses a simple central metaphor, a symbolic setting and a small cast of main characters. In his sense there is also some similarity to Samuel Beckett's play. But Beckett is the complete antipode to Tagore. He decomposes language to evoke meaninglessness. Unlike Beckett, Tagore by everything. (Nupur, 2007 : Preface)

*রক্তকরবী*তে কবির ভাষায় 'নন্দিনীর পালা'। এই *রক্তকরবী*তে অভিনয় করার ইচ্ছে রবীন্দ্রনাথ মনে পোষণ করেছেন দীর্ঘকাল। বিশ্বভারতীতে বেশ কয়েকবার এর মহড়াও শুরু করা হয়েছিল। ১৯২৯ সাল পর্যন্ত বিভিন্নভাবে কখনো রেখা রায়'কে কখনো অমিতা ঠাকুর'কে নন্দিনীর ভূমিকা দিয়ে মঞ্চায়নের পরিকল্পনা নিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন কবি। তাঁর ভাষায় :

> আমি নিজে কখনো *রক্তকরবী* করিনি। কেন করিনি তাও বলি। আমার কলম থেকে যে নন্দিনী রূপ নিয়েছে বাস্তবে তার সন্ধান আমি পাইনি। আজও সে আমার দেখার আড়ালে আছে। তাই *রক্তকরবী* আমি ধরতে পারলুম না। (রুদ্রপ্রসাদ, ১৯৯৫ : ১৯৫)

পরবর্তীকালে বিহার ভূমিকম্প পীড়িতদের সাহায্যকল্পে 'দ্য টেগোর ড্রামাটিক গ্রুপ' কলকাতার নাট্যনিকেতনে *রক্তকরবী*র সর্বপ্রথম অভিনয়ের আয়োজন করে ১৯৩৯ সালের ৬ এপ্রিল, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালনায়। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় এবং দুর্লভ উপস্থিতিতে এক রাতের জন্য হলেও *রক্তকরবী* অভিনীত হল। অভিনয় শেষ হলে অবনীন্দ্রনাথকে ডেকে কবি জানতে চাইলেন : "অবন, এমন অনবদ্য নন্দিনীর সন্ধান পেলে কী করে? মেয়ে কোন বাড়ির?" অবনীন্দ্রনাথ হেসে জবাব দেন, "ও মেয়ে নয়। আমাদের অভয়ানন্দর ভাগনা" (রুদ্রপ্রসাদ, ১৯৯৫ : ১৯৬)। ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত বিস্ময়ের গ্রন্থিমোচন যিনি করেছেন, তিনিও বিস্মিত হলেন নন্দিনীর এরূপ রূপায়ণে।

২০-এর দশকের নাট্যচর্চায় রবীন্দ্রনাথকে যদি কেউ সফল এবং সহজবোধ্য উপস্থাপনায় মঞ্চে আনেন এবং নাট্যপ্রেমীদের কাছে রবীন্দ্রনাটকের দুর্বোধ্যতার পথ সুগম করে দেন, তিনি নট-নাট্যকার-নির্দেশক শম্ভু মিত্র। শরীর নয়, দৃশ্য নয় – কথা, কথার উচ্চারণে যিনি এক মাত্রা যোগ করেছিলেন অভিনয়ে– by the psychological readings of the characters. চরিত্রের কত গভীরে যাওয়া যায়, কথার পিছনে কী মানে আছে, কোন শব্দের কী রূপকল্প এবং সে রূপকল্প কীভাবে দর্শকের কল্পনায় টোকা দিয়ে প্রত্যেকটা ইমেজকে একস্তর থেকে অন্যস্তরে নিয়ে যাওয়া যায়, দূরবর্তী ভাসমান প্রবাহে – তার সাক্ষী সে সময়ের দর্শক। *চার অধ্যায়* প্রযোজনায় যার শুরু, *রক্তকরবী*তে তার প্রতিষ্ঠা এবং *রাজা*তে তারই বিস্তার। রবীন্দ্রনাটকের সংলাপ রচনার অন্তর্নিহিত শক্তিকে বাচিক অভিনয়ে মূর্ত করা সহজ নয়। তার ছন্দোস্পন্দন ও বাক্যের গঠন পরস্পর প্রতিস্পর্ধী। শম্ভু মিত্র এ অভিনবত্বকে অনুভব করে তাকে শিল্পিত অবয়ব দিলেন। তার ফলে প্রযোজনা এক আশ্চর্য Passion-এ প্রস্ফুটিত হলো। শমীক বন্দোপাধ্যায় তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন :

> *রক্তকরবী* শম্ভু মিত্রের এক অসাধারণ প্রযোজনা। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের ভিতরে যদি কেউ যায় তাহলে সে কিন্তু *রক্তকরবী*-র এই ইমেজে পৌঁছে যেতে পারে। যে জন্য খালেদদারাও যখন রং, ডিজাইন করতে গেছেন, তার আগে তারা কিন্তু শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। রামকিঙ্করের কাছে গেলেন, নন্দলাল বসুর কাছে গেলেন এবং সে Images, সেই vision সেগুলো এসেছে। তার মধ্যে রয়েছে গগনেন্দ্রনাথের ছবি। তাই যেটা রক্তকরবীর সবচেয়ে strong জায়গা তা হলো visual composition or visual quality যেটা শিশির বাবু চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি। রবীন্দ্রনাথের কাছে আসতে রবীন্দ্রনাথও চেয়েছিলেন। যদি ওটা হতো তাহলে হয়তো অন্যরকম নাটক রবীন্দ্রনাথও লিখতেন। (শমীক, ২০০৭ : ৫৫)

রক্তকরবী প্রযোজনা সংক্রান্ত শম্ভুমিত্রের সেই বিশাল পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, এই নাটকটি বিশ্লেষণে তিনি কী পরিমাণ যত্নশীল ছিলেন এবং নাট্যাভিনয়ে কতটুকু সততা ছিল *রক্তকরবী* নাট্যপ্রস্তুতিতে নিযুক্ত সকলের। এরপরেও বাঙালির নাট্যচর্চায় সফলতা-অসফলতা মিলিয়ে গত ৬

দশকে দুই বাংলাতেই রবীন্দ্রনাথের *অচলায়তন*, *রাজা*, *মুক্তধারা*, *রক্তকরবী*, *ডাকঘর*, *বিসর্জন* যেমন মঞ্চে এসেছে বার বার, তেমনি *গোড়ায়গলদ*, *চিরকুমার-সভার* মতো সরস নাটক এবং প্রচুর হাস্য ও ব্যঙ্গকৌতুকও। অভিনীত হয়েছে গীতিনৃত্যনাট্য– *তাসের দেশ*; নৃত্যনাট্য– *শ্যামা*, *চিত্রাঙ্গদা*, *বাল্মীকিপ্রতিভা*, *মায়ার খেলা*, *চণ্ডালিকা*, *কালমৃগয়া* – নানা রূপকল্পে। ছোটগল্প ও উপন্যাসের নাট্যরূপকল্প – *ঘরে বাইরে*, *চার অধ্যায়*, *দুই বোন*, *পোস্টমাস্টার*, *শেষের কবিতা*, *মুক্তির উপায়* ইত্যাদি।

তাহলে কেন মঞ্চস্থ হচ্ছে এসব বিচিত্র রসের, বিচিত্র রূপের রবীন্দ্রনাটক? শুধুই বিনোদনের জন্য, জলসার মেজাজে? নিশ্চয়ই কেউ না কেউ প্রাসঙ্গিক বা জরুরি মনে করে রচনাটি। তাই একজন নাটকটির প্রযোজনা ও অভিনয় পর্যন্ত এগিয়ে যাবার পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে। শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্র নাটক প্রযোজনায় সংলাপের অন্তর্নিহিত শক্তিকে অনুধাবন করে নির্মাতার চিত্তকল্পে সৃষ্ট ইমেজগুলোকে মঞ্চে উপস্থাপন করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নাট্যের আঙ্গিককে বহিরাবরণে ভরে না তুলে দর্শককে কল্পনার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই মূল বিষয় হওয়া উচিত নাট্যক্রিয়া সম্পাদনে। এই পর্যায়ের নাটকগুলো অর্থাৎ *ডাকঘর*, *রক্তকরবী*, *রাজা* এই নাটকগুলোর মঞ্চায়নে 'যাত্রার তুল্য মুক্তি' – এই ভাবনার প্রতিফলন এক নব নাট্যভাষা সৃষ্টি করতে পারে বলে আমি মনে করি। 'রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় যোগ্যতা' প্রবন্ধে প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাথের নাটককে বিশ্লেষণ করেন এই বলে :

> রবীন্দ্রনাথের দ্বারা পেশাদার রঙ্গমঞ্চ প্রভাবিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, তিনি নিজে কখনো পেশাদার রঙ্গমঞ্চ দ্বারা অর্থাৎ গণচিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষার সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হন নাই। ইহা গৌরব করিবার বিষয় নয়, নাট্যকারের পক্ষে ইহা একটি অবাঞ্ছিত অপূর্ণতা। শেক্সপিয়র সমকালীন রঙ্গমঞ্চকে প্রভাবিত করিয়াছিলেন, তেমনি নিজেও প্রভাবিত হইয়াছিলেন। গীতিকবি বা ঔপন্যাসিক গণ-সংঘাত হইতে দূরে অবস্থান করিয়া শিল্পসৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু নাট্যকারের পক্ষে তেমন বিভক্তভাবে অবস্থান সম্ভব নয়, তেমন ব্যবধান ঘটিলে তাঁহার শিল্পসৃষ্টি অপূর্ণ হইতে বাধ্য। (প্রমথনাথ, ১৯৮৮ : ৪০৮)

গণচিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষার সংস্কার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত নন – বিশ্লেষণটি বেশ সত্য কি? রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে সবসময় এটা দেখিয়েছেন যে, মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি অর্থলোভী অমানবিক সমাজ-ব্যবস্থার কী প্রতিফলন ঘটে সেটাই মূল বিচার্য। আজ যখন যন্ত্রের ব্যাপকতায় সমাজবদ্ধ মানুষ ক্রমেই একা হয়ে যাচ্ছে – একটা বৃত্তের মধ্যে বন্দি মানুষ যখন দিনরাত একই আবর্তে ঘুরে চলেছে ক্রমাগত – এখনওতো আমরা শুনি সেই হাহাকার। 'ব্যক্তিত্বের বিকাশ', 'মানুষের সক্রিয়তার বিকাশ' আজ যেন নজরবন্দী। একটু নড়লেই শেকলে টান পড়ে। যান্ত্রিক সভ্যতার সঞ্চয়গর্বের ঔদ্ধত্যে গাঁয়ের সহজ-সরল মানুষগুলো খনিতে এসে নিজের অস্তিত্ব বিলোপ করে কীভাবে দশ-পঁচিশের ছকে পরিণত হয় এবং বুকের উপর দিয়ে নিরন্তর জুয়া খেলা চলতে থাকে – তাকে অবলোকন করলেন কবি কোন অন্তর্দৃষ্টিতে। আর জনতা, এরা তো রবীন্দ্রনাথের নাটকের এক অপরিহার্য উপাদান। প্রায় সব নাটকেই নানা রূপে, নানা বেশে, নানা রসে, নানা আয়োজনে জনতার ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেছে নাট্যঘটনা। গণচিত্তের আকাঙ্ক্ষা বুঝতে হলে থিয়েটারে সাধারণ জনতার কাতারে বসে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় খুব জরুরি নয়।

জরুরি অন্তর্দৃষ্টিতে, মানসচক্ষে তা অবলোকন করা। এই মানবতাবাদী কবি যাতে ব্রত ছিলেন আজীবন।

হ্যাঁ– বলা যায়– তাঁর নাটকের ভাষা নিয়ে– যা কোথাও কোথাও, কখনো কখনো অতিমাত্রায় রূপকাশ্রিত, নিত্য ব্যবহৃত ভাষার অনেক ঊর্ধ্বে। এখন তো এই গতির যুগে, একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের পসরায়, World Wide Web এর বিড়ম্বনায় কমী-অকর্মী নির্বিশেষে কার-ই বা অত ফুরসত আছে থিয়েটারে যাওয়ার বা নাট্যসাহিত্য খুঁটিয়ে পড়ার? কবির ভাষায় : "সাহিত্য পাঠ করিবার সময় আমরা সকলেই মনে মনে অভিনয় করে থাকি।" এ কল্পনাপ্রবণ মনটির বড্ড প্রয়োজন আজকের থিয়েটারে। তখনই পুরো সৃষ্টিটা বাঙময় হয়ে উঠবে।

চেখভ যেমন গোগোলকে নিয়ে বলেছিলেন : "গোগোল-কে দর্শকদের স্তরে নামিয়ে এনো না, বরং দর্শকদেরই উন্নীত করো গোগোলের স্তরে।" সুতরাং আজকের সময়ে বিশেষ করে When the Gobal village has become the digital bazar এবং মানুষে মানুষে তড়িৎ যোগাযোগ যেভাবে দ্রুত অবনতি ঘটাচ্ছে মানুষে মানুষে সর্ম্পকের এবং মানুষ যেভাবে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে তার শেকড় থেকে, তখন মঞ্চ নাটককে নির্ধারণ করতে হবে, কী হবে তার Production Process. সে নাট্যকারের ভাষাকে সহজ Translation (Simple Transfer) করবে রূপকল্পে? নাকি সাথে সাথে Transculaturation, Transliteration Ges Transtemporal ও করবেন। যা অতি প্রয়োজন আজকের এই জগৎজোড়া জালের দৌড়ে টিঁকে থাকতে গেলে। এ প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য :

> 'যা কিছু নাটুকেপনা তার থেকে ছাড়িয়ে নিতে হবে নাটককে' এই হচ্ছে এক সাম্প্রতিক ধুয়ো। আধুনিক বিদেশী নাটকে তাই আমরা নাটকের প্রচলিত গড়নকে ভেঙ্গে পড়তে দেখেছি বারবার, এক-একটা দ্রুত পর্যাবসানের মধ্য দিয়ে আজ অ্যবসার্ড বা উদ্ভট নাটকের জগতে এসে দাঁড়িয়েছি। লক্ষ করতে হবে যে আমাদের দেশে এই মুক্তির একটা সুত্র তৈরী হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের হাতেই। তাঁর নাটকের ইতিহাস আমাদের দেখিয়ে দেয় কেমন করে তিনি বর্জন করেছেন চল্‌তি চরিত্রের অথবা প্লটগঠনের ধারণা, কেমন করে স্থানকালের বিন্যাসকে ক্রমে নিবিড় ঐক্যের মধ্যে ধরে এনে আবার টুকরো করে ছড়িয়ে দিচ্ছেন, মঞ্চবিহীন কিছু বা এক্সপ্রেশনিষ্ট ধরনে। *ফাল্গুনী*র মঞ্চবিহীন খোলামেলা অভিনয়ে যে তিনি দর্শক আর অভিনেতার মধ্যে অনায়াস যোগ খুঁজছিলেন অথচ প্রচলিত রীতির বাইরে এনে নাটককে জড়িয়ে নিচ্ছিলেন নাচগানের সম্মিলিত পার্বনে- এই সবই আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ করবার বিষয়। (শঙ্খ, ২০০৯ : ১৯)

সুতরাং, প্রাণচাঞ্চল্যের যে ক্রমাবনতি বর্তমান সমাজে তা পুনরুদ্ধারের জন্যে এবং এ বন্ধ্যা সময়ে প্রাণের সঞ্চার করতে রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কর্ম, দর্শন, সমাজনীতি, মানবতার-চর্চা একটা বড় মাধ্যম হতে পারে। এখন আশা সেই আগামীর পরিচালকটির, যিনি নাট্যকারের সমকক্ষের মতো রবীন্দ্রনাটকে হাত দেবেন। ভয় পাবেন না, ভক্তিতে নুয়ে পড়বেন না, রবীন্দ্রনাথকে ভাঙচুর করে তাঁকেই পরিপূর্ণ মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করবেন। যেমনটি নূপুর গাঙ্গুলী লাহিড়ী তাঁর *রক্তকরবী*র ইংরেজি রূপান্তরে করেছেন। যেখানে গোঁসাই, ছোট সর্দার, মেজো সর্দার, দ্বিতীয় মোড়ল এবং দলের লোক যারা মদ, অস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে আসেন, সে সব চরিত্র একেবারেই বাদ। সহজবোধ্য করে

সংলাপের পুনর্গঠন, কিছু গান বাদ, আবার তাতে একটা নতুন গানের সংযোজন। তাঁর মতে :

> My dream is perhaps this version of Red Oleanders will be presented on mainstream stages everywhere and today's viewers will appreciate Rabindranath Tagore, predicting the future of mankind in the context of contemporary civilization some eighty years ago. (Nupur, 2007 : Introduction)

রবীন্দ্রঙ্কলার ড. আনন্দলাল তাঁর বইতে বলেছেন : "I hope that future translators might prepare freer versions of adaptations […]" (Nupur, 2007 : Introduction)

শুধু বিনোদননির্ভর নাট্যচর্চার তরী এখন আর ভাসেনা বাংলার রঙ্গমঞ্চে। ব্যবসায়ী রঙ্গমঞ্চের আদলে বসে না সান্ধ্যআসর। ঝাড়বাতির ঝলমলে আলোর জায়গায় টর্চ, হারিকেন আরো কত বিকল্প আলোর সোর্সকে কাজে লাগিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে নাট্য উপস্থাপনায় বিকল্প রূপের সন্ধানে। কখনো Picture frame stage-কে মেনে আবার কখনো তার সীমাবদ্ধতাকে অগ্রাহ্য করে। সেই স্রোতে রবীন্দ্রনাট্যচর্চার প্রবাহ ক্ষীণপ্রায়। উদাসীনতা আজও বর্তমান দুই বাংলার নাট্য রঙ্গমঞ্চে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অভাবটা কোথায়? সামর্থ্যের? না মননের? নাকি প্রমথনাথ বিশী আজ থেকে প্রায় সাত দশক পূর্বে যেমনটি আশঙ্কা করেছিলেন তাই সত্যি? "দেশে যতই শিক্ষার বিস্তার হোক, রুচি যতই উন্নত হোক, রবীন্দ্রনাটক কখনো সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বস্তু হয়ে উঠবে না" (প্রমথনাথ, ১৯৮৮ : ৪০৯)। এটাই কি অমোঘ সত্য? তাই যদি হয়, তাহলে এ দায় বাঙালির, এ দায় বাংলা নাট্যমঞ্চের। কেবলমাত্র দু'একজন নাট্যনির্মাতার নয়। এখন সর্বসাধারণের রঙ্গমঞ্চে ব্যাপক চর্চার প্রয়োজন রবীন্দ্রনাটকের। শুধু গুটিকয়েক সুধী সমাজের জন্য বা মাত্র কিছু গুণগ্রাহী রসিকের জন্য নয়। যে সার্বজনীন সত্যের কথা লুকিয়ে আছে *রাজা*, *রক্তকরবী*, *ডাকঘর* বা *অচলায়তনের* প্রতিটি সংলাপে। কল্পনার রাজ্যে সেই সত্যের নিবিড় অনুভবের মধ্যেই ফুটে উঠবে শিল্পের মহিমা। এখন এই অতিমারীর সময়ে পুরো বিশ্ব জুড়ে সবাই যেন 'অমল' এর প্রতিরূপ। সব আলোর পথ বন্ধ করে দিয়ে গৃহবন্দী আজ সবাই। উদাসী মন চাপা পড়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছে চার দেয়ালের আড়ালে। সবাই অধীর প্রতীক্ষায় একটি মাত্র মন্ত্র উচ্চারণে – কবে 'মুক্তি' হবে মানবজাতির। নতুন নাট্যব্যাখ্যান সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু মহাকালের ঘূর্ণাবর্তে। চিত্তপট থেকে চিত্রপটে দেখার দুয়ারটা খোলা রাখতে হবে শুধু। সুতরাং আজকের থিয়েটার অবশ্যই *রাজার* রূপে, সমস্ত *অচলায়তন* ভেঙ্গে, সকল হীনতা, নীচতা, দীনতা *বিসর্জন* দিয়ে *মুক্তধারার* মতো এই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে দেবে *রক্তকরবীর* মঞ্জরী। হয়তো কোন এক সুদূর *ডাকঘর* থেকে। ততদিন থিয়েটারের পথ চলুক *কালের যাত্রায়*।

সহায়কপঞ্জি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯০)। *ঘরোয়া*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা।

অজিত কুমার ঘোষ। *ঠাকুরবাড়ির অভিনয়*। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স লিঃ, কলিকাতা।

দেবকুমার বসু (সম্পা., ২০০৭)। *নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার রচনা সংগ্রহ*। নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট কলকাতা।

প্রমথনাথ বিশী (১৯৮৮)। *রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ*। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা।
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৩২৬)। *জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি*। শিশির পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০২)। *নাট্যকথা*। নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট, কলকাতা।
রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী (১৯৯৫)। *রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ সমকালীন প্রতিক্রিয়া*। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা।
(১৯৯৯)। *সাধারণ রঙ্গালয় ও রবীন্দ্রনাথ*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা।
শঙ্খ ঘোষ (২০০৯)। *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৭)। *থিয়েটারের জলহাওয়া*। প্যাপিরাস, কলকাতা।
Nupur Ganguly Lahiri (2007) . *Red Oleanders : Translation & Adaptation*. Barnana Prokasoni, Kolkata.